উন্নয়নের অর্থনীতি ও অমর্ত্য সেন

মৈত্রীশ ঘটক

১

অর্থনীতিচর্চার জগতে অমর্ত্য সেনের কর্মধারা আক্ষরিক অর্থেই বহুধাবিস্তৃত। তাঁর প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশ পায় ১৯৫৭ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ, আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা নিয়ে এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর আর জঁ দ্রেজের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রবন্ধ বেরোয়[1], যখন তাঁর বয়স নব্বই পেরিয়েছে। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা তিনশোর বেশি, এবং প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশের বেশি। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখার সংখ্যা অগণিত। (*অনুষ্টুপ*-এর বর্তমান সংখ্যাটিতে তাঁর লেখাপত্রের কিছু খতিয়ান দেওয়া আছে।) সংখ্যা দিয়ে অবশ্যই তাঁর মতো চিন্তাবিদের লেখার প্রভাব ও গুরুত্ব ধরা যায় না, কিন্তু তাহলেও তাঁর বিপুল কর্মধারার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। আর শুধু অর্থবিদ্যা কেন, দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর গবেষণার প্রভাব অপরিসীম। তা ছাড়া সমসাময়িক ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনীতি, ইতিহাস, ও সংস্কৃতি সব বিষয়েই তাঁর স্বচ্ছন্দে বিচরণ এবং তাঁর গ্রন্থগুলি অর্থনীতি বা দর্শনশাস্ত্রের বাইরে দেশে বিদেশ অগণিত সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের গ্রন্থসংগ্রহে সসম্মানে বিরাজ করছে।

আমার নিজের গবেষণার মূল বিষয় উন্নয়নের অর্থনীতি, যা অধ্যাপক সেনের নানা বিষয়ের কাজের মধ্যে একটি ধারা মাত্র। তাহলেও, তাঁর গবেষকজীবনের প্রথম থেকেই এটি তাঁর গবেষণার একটি কেন্দ্রীয় ধারা, যা নোবেল কমিটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপত্রে উল্লিখিত বিষয় কল্যাণমূলক অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই প্রবন্ধের পরিধির এবং আমার নিজস্ব সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতেও তাঁর বহুব্যাপী কাজের সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব। তাই, তার চেষ্টাও করব না। তবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-র গবেষণা করার সময় তাঁকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।[2] আর তারপর প্রায় তিন দশক এই বিষয়ে অধ্যাপনা এবং গবেষণা করার অভিজ্ঞতায় তাঁর প্রভাব অনুভব করেছি, সচেতন এবং অচেতন, দু'ভাবেই। মনে হল বর্তমান জমানায় আমরা যারা এই বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপনা করি, গবেষণাপত্র লিখি, বা অন্য গবেষকদের কাজের মূল্যায়ন করি নানা আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রের সম্পাদক বা বিশেষজ্ঞ পাঠক হিসেবে, আমাদের চিন্তাধারায় অধ্যাপক সেনের কয়েকটি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো কিছু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

---

[1]Dreze, Jean and Sen, Amartya; 'Towards responsibility', *The Telegraph*, 24 February, 2025

[2]এখানে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে উল্লেখ করতেই হয় যে হার্ভার্ডে ছাত্রাবস্থায় আমার যে বিশিষ্ট অধ্যাপকদের উন্নয়নের অর্থনীতি নিয়ে বক্তৃতামালা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে, ঘটনাচক্রে তাঁদের মধ্যে তিনজন বাঙালি। অধ্যাপক সেন ছাড়া শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়-কে, যিনি সেই সময়ে হার্ভার্ডে নবীন অধ্যাপক, তারপর এমইআইটি চলে যান, আর দেবরাজ রায়-কে, যিনি সেই সময়ে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন এবং অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আমাদের এক সেমেস্টার পড়িয়েছিলেন।

সম্পাদকদের কাছ থেকে এই প্রবন্ধটি লেখার অনুরোধ যখন আসে, লেখাটির পরিধি এই মর্মে সীমাবদ্ধ করার পরেও এই বিষয়ে ভাবতে এবং অধ্যাপক সেনের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলো পুনর্বার পড়তে গিয়ে বুঝলাম যতটা বিস্তার এবং গভীরতার সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে, তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত একটি লেখার পরিসরের মধ্যে সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই, উন্নয়নের অর্থনীতির পঠনপাঠন ও গবেষণায় অধ্যাপক সেনের মৌলিক প্রভাব নিয়ে প্রাথমিক কিছু ভাবনাচিন্তার উপস্থাপনা হিসেবে এই লেখাটি পড়লে যথাযথ হবে।

২

খুব সরল করে বলতে গেলে, চিকিৎসাবিদ্যা যেমন মানুষের সুস্বাস্থ্যের নির্ণায়ক উপাদানগুলি কী এবং মানুষে মানুষে স্বাস্থ্যের অবস্থার তফাত কী কী কারণে হয় এবং এর থেকে কোন কোন উপায়ে স্বাস্থ্যোন্নতি করা যায় বা, অসুখ সারানো যায়, এগুলো বোঝার চেষ্টা করে, উন্নয়নের অর্থনীতিও খানিকটা সেইরকম। তার লক্ষ্য হল কোনও ব্যক্তি বা সমষ্টির অর্থনৈতিক অবস্থা কোন কোন উপাদানের ওপর নির্ভর করে তা বিশ্লেষণ করা এবং এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে যে যে নীতি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক হতে পারে, সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করা।

আপাতভাবে সরল এই বর্ণনায় লুকিয়ে আছে অনেকগুলো ধাপে অনেকরকম জটিলতা। প্রথম ধাপেই আছে 'মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা' এই ধারণটা আর তার উপযুক্ত সূচকগুলো কী, এবং কীভাবে তাদের মাপা হবে এই বিষয়গুলো, যার কোনওটারই সহজ উত্তর নেই। তার পরের ধাপ হল তথ্য-পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এই বিভিন্ন সূচকগুলির বিন্যাস নির্ধারণ করা এবং মানুষে-মানুষে, পরিবারে-পরিবারে, অঞ্চলে-অঞ্চলে, রাজ্যে-রাজ্যে, বা দেশে-দেশে (বা অন্য যে কোনও আর্থসামাজিক সমষ্টি বা শ্রেণিগুলোর মধ্যে) এই সূচকের যে পরিমাপ তার ভিন্নতার নির্ণায়ক উপাদানগুলো নির্ধারণ করা। তলস্তয়ের *আনা কারেনিনা* উপন্যাসের সেই বিখ্যাত উক্তি, "সব সুখী পরিবারই একরকমের; আর, প্রতিটা দুঃখী পরিবার নিজের মতো করে দুঃখী"[3] অনুসরণ করে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাবের পেছনে আছে অনেক সম্ভাব্য উপাদান, তাই এই কাজটিও সোজা নয়। আর ধারণা, সূচক, তা নিয়ে তথ্য পরিসংখ্যান, এবং পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য উপাদানগুলো চিহ্নিত করার পরে সর্বশেষ ধাপ হল কোন কোন নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা যাবে তা নির্ণয় করা। অনুন্নয়নের উপসর্গ এবং তার সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করার পরে এই ধাপটি একদিক থেকে সবচেয়ে বাস্তবধর্মী। আবার একই সঙ্গে বিভিন্ন সম্ভাব্য নীতির মধ্যে কোনটা গ্রহণ করলে কোথায় এবং কাদের জন্যে সবচেয়ে কার্যকর হবে, এবং তাদের আপেক্ষিক ব্যয়-প্রাপ্তির হিসেব কী করে করা হবে সেই বিষয়টিও যথেষ্ট জটিল।

উন্নয়নের অর্থনীতিচর্চায় অধ্যাপক সেনের সবচেয়ে *দৃশ্যমান* অবদান উন্নয়নের ধারণার বহুমাত্রিক দিকগুলো তাত্ত্বিকভাবে উন্মোচিত করা এবং তার কিছু বিকল্প সূচকের প্রস্তাব দেওয়া। শুধু তাই

[3] "All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way."

নয়, এই সূচকগুলো আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে নীতিনির্ধারকদের দ্বারা যাতে গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়, তার জন্যে তিনি নিরন্তরভাবে গবেষণার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করার জন্যে লিখে গেছেন। এখন শুধু রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) বাৎসরিক মানব উন্নয়ন রিপোর্ট (যার কথায় আসছি) বা বিশ্বব্যাংকের বাৎসরিক বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট নয়, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের একাধিক রিপোর্ট এবং গবেষণাপত্রে অসাম্য ও দারিদ্র নিয়ে আলোচনা দেখা যাচ্ছে, যা কয়েক দশক আগেই অভাবনীয় ছিল। যে দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় এখন যে কোনও অর্থনৈতিক আলোচনায় শুধু জাতীয় আয়, তার বৃদ্ধির হার, মূল্যস্ফীতি বা বেকারির হার নিয়ে কথা হলে, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র, অসাম্য, এবং মানবসম্পদ বিকাশের কথা উঠে আসে, তাতে অধ্যাপক সেন যে একজন পথিকৃৎ, সেটা তাঁর সমালোচকরাও অস্বীকার করতে পারবেন না।

উন্নয়নের সূচকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বহুলব্যবহৃত হল গড় বা মোট জাতীয় আয় এবং তাদের বৃদ্ধির হার। মূলধারার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে বক্তৃতামালায় এখনও এই সূচকগুলো নিয়েই আলোচনা শুরু হয়। জনপ্রিয় হলেও উন্নয়নের সূচক হিসেবে গড় আয়ের সীমাবদ্ধতা প্রচুর। মোট আয় বা গড় আয় দিয়ে একটা দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান আন্দাজ করার মূল সমস্যা যে কোনও সূচকের 'মোট' বা 'গড়'-এর ধারণাটিরই মধ্যে নিহিত। একটা উদাহরণ দিই। আপনাকে যদি বলা হয়, আপনি যেখানে যেভাবে আছেন তার সব ছেড়েছুড়ে এমন একটা দেশে বা শহরে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে মোট বা গড় আয় অনেক, আপনি প্রথমেই কী ভাববেন? গড় বা মোট আয় দিয়ে আমি কী করব, আমার নিজস্ব আয় কি আমার বর্তমান অবস্থার থেকে বেশি হবে? অর্থাৎ, আয়ের বৈষম্য এবং বিশেষ করে গড়ের থেকে অনেক কম আয় যাঁদের, তাঁদের জীবনযাত্রা কেমন এটা না জানলে একটি ব্যক্তির, একটি পরিবারের, একটি অঞ্চলের, একটি রাজ্যের বা একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এবং সময়ের সঙ্গে তার পরিবর্তনের মূল্যায়ন করা অসম্ভব। মোট বা গড় জাতীয় আয়ের সূচকের দ্বিতীয় মূল সীমাবদ্ধতা হল এতে শুধু যে সব পণ্য ও পরিষেবা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তার মূল্য ধরা পড়বে। জীবনযাত্রার মানের আবশ্যক যা যা উপাদান, যেমন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-পরিকাঠামো-আইনশৃঙ্খলা তার কিছুই এতে ধরা পড়বে না।

জটিল সমস্যার মুখোমুখি হলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল সমস্যাটির আপাতদৃষ্টিতে সরল মাত্রাগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া। উন্নয়নের অর্থনীতির একটি যে মূল ধারা, যা এসেছে সামষ্টিক অর্থনীতি (macroeconomics) থেকে, যার মধ্যে আছে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (economic growth) বা সামষ্টিক উন্নয়ন অর্থনীতি (macrodevelopment), তাদের যে বহুলব্যবহৃত তাত্ত্বিক কাঠামো তাতে এই সমস্যাগুলো দুটো পূর্বানুমান দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়: সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এরকম একজন ব্যক্তি আছেন এবং একটাই পণ্য আছে। শুনে মজা লাগতে পারে, কিন্তু আক্ষরিকভাবে এরকম কাঠামোকে 'রবিনসন ক্রুসো' মডেল বলা হয়— সত্যি যদি তাই হত, তাহলে সমস্যা ছিল না। সরলীকরণে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু সমস্যা হয় যখন সরলীকরণ করা সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে সেটাই সত্যি, অন্য কথা না ভাবলেও চলে— এই ভ্রান্তিতে বা অস্মিতায় মানুষ আচ্ছন্ন হয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বা মোট বা মাথাপিছু জাতীয় আয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় একটি দেশের আপেক্ষিক অবস্থান নিয়ে যে আলোচনা চলতেই থাকে, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি কিন্তু এই রবিনসন ক্রুসো মডেল। এখনও উন্নয়নের অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরের

আলোচনায় এইরকম তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়েই আমরা পড়ানো শুরু করি, এবং আলোচনা করি নব্য-ধ্রুপদী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূল মডেলগুলো, যার মধ্যে রবার্ট সোলো এবং ট্রেভর সোয়ান থেকে শুরু করে রবার্ট লুকাস, পল রোমার, এঁদের কাজগুলো আছে।[4] অমর্ত্য সেনের প্রথম দিকের গবেষণা খানিকটা এই ঘরানায় (যেমন, *Quarterly Journal of Economics*-এ তাঁর ১৯৫৭ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণাপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Notes on the Choice of Capital-Intensity in Development Planning'. শুধু তা-ই নয়, ১৯৭০ সালে *Growth Economics* (Penguin) বইটির সম্পাদক হিসেবে তাঁর মুখবন্ধটি এখনও এই বিষয়ে একটি অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ।

৩

আপাতসরল হলেও সামষ্টিক অর্থনীতির এই কাঠামো, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে মাথাপিছু জাতীয় আয় আর তার বৃদ্ধির হারের ওপরে মনোনিবেশ করে, বেশ সমৃদ্ধ এবং কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরে এখনও তাদের ব্যবহার জনপ্রিয়। তাই মূলধারার অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে পঠনপাঠনে শুরু করা হয় বৃদ্ধিতত্ত্ব ও বিভিন্ন দেশের গড় জাতীয় আয় আর তার বৃদ্ধির হার সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে। কিন্তু এই তাত্ত্বিক কাঠামোর দু'টি বড় সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, মানুষে মানুষে সুযোগ, সম্পদ, কর্মদক্ষতা, এবং পছন্দ বা আকাঙ্ক্ষায় অনেক পার্থক্য আর তাই যে নীতি বা অর্থনৈতিক পরিবেশ একজনের জন্যে খুব ভাল, তা আরেকজনের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে; দ্বিতীয়ত, আয় বা তার বৃদ্ধি জীবনযাপনের মানের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হতে পারে, কিন্তু তার সমার্থক নয়। এই দু'টি সমস্যা নিয়েই অধ্যাপক সেনের চিন্তাধারা উন্নয়নের অর্থনীতিচর্চায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এই প্রবন্ধের এই অংশে প্রথম বিষয়টি, এবং পরের অংশে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

গড় বা মোট আয় দিয়ে কোনও সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাচাই করার যে প্রথম প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করলাম, তা অসাম্য ও দারিদ্র এই দুইটি বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এই বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা চলেছে অনাদি-অনন্ত কাল থেকে, কিন্তু উন্নয়নের অর্থনীতিতে এদের স্থান এবং উন্নয়নের সূচক হিসেবে এদের ভূমিকা নিয়ে আমাদের ধারণাগত স্বচ্ছতা আনার পেছনে যাঁদের অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন অধ্যাপক সেন। তাঁর নানা প্রবন্ধ এবং বইয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর সৃজনশীল চিন্তাধারা মূলধারার অর্থনীতিচর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।[5]

[4]তারও আগে আছে ফেল্ডম্যান, হ্যারড, ডোমার, এবং মহলানবীশের বৃদ্ধির মডেল যা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জমানায় খুব ব্যবহার করা হত।

[5]এই বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর তিনটে বই: *On Economic Inequality* (New York: Norton, 1973), *Inequality Reexamined* (Oxford: Clarendon Press, 1992), এবং *Development as Freedom* (New York: Alfred Knopf, 1999) কিন্তু এই নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সহজবোধ্য পরিচয় পেতে চাইলে পাঠক তাঁর ১৯৭৯-তে দেওয়া ট্যানার বক্তৃতা "Equality of What?" (in S. McMurrin, ed., *Tanner Lectures on Human Values*, Volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press,1980), যা ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যায়, পড়ে দেখতে পারেন।

অসাম্য বলতে অর্থনীতিতে সাধারণত আয় বা সম্পদের কথা বলা হয়। যেমন, দুই জায়গায় গড় আয় এক হলেও, এক জায়গায় চরম দারিদ্রের পাশাপাশি সীমাহীন বৈভব থাকতে পারে, আর অন্য জায়গায় আয় অনেকটা সমভাবে বন্টিত হতে পারে। আমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক কল্যাণের মাপকাঠি যদি প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল হয়, তাহলে উন্নয়নের সূচকে সার্বিক আয় না দেখে আয়ের বন্টনও দেখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু ফলাফলের অসাম্য নয়, সুযোগের অসাম্যের কথাও ভাবতে হবে। সমান সুযোগ পেয়ে ভিন্ন ফলাফল হলে তাতে ভাগ্য বা নিজস্ব পরিশ্রম বা উদ্যমের ভূমিকা বেশি হবে, কিন্তু সুযোগের যেহেতু অনেকগুলো মাত্রা (যেমন, দু'জন মানুষের পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি এক হলেও শিক্ষাগত পরিবেশ আলাদা হতে পারে) সুযোগের সাম্য কী করে বাড়ানো যায়?

সুযোগ আর ফলাফল বাদ দিয়ে আরও একটা বিষয় হল, কার কাছে কীভাবে ফলাফলের মূল্যায়ন করা হবে— যা কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটা মৌলিক সমস্যা। মূলধারার অর্থনীতিতে অধিকাংশ সময়ে কোনও পরিস্থিতির ভালমন্দ যাচাই করতে যে নিক্তি ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ, তৃপ্তিযোগবাদ(utilitarianism), তা প্রয়োগ করার অনেক সমস্যা। 'সর্বাধিকসংখ্যক লোকের সর্বাধিক পরিমাণে কল্যাণসাধন' আপাতদৃষ্টিতে সাধু উদ্দেশ্য হলেও, এর প্রয়োগে অনেক সমস্যা। যেমন, একজন দরিদ্র মানুষের কৃষিজমি নিয়ে সেখানে শিল্পস্থাপন করলে হয়তো সামগ্রিকভাবে অনেকের উপকার হবে, কিন্তু সেটা যে সাম্যের ধারণার সঙ্গে খুব সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সাধারণ বুদ্ধিতে সেটা বোঝা শক্ত নয়। আর তা ছাড়া, যাঁর কল্যাণের কথা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন ধরা হবে না তাঁর শুভানুধ্যায়ী কারও মূল্যায়ন ধরা হবে সেটা সব সময়ে পরিষ্কার না— ধরা যাক, আমি এমন কিছু করছি যাতে সেই মুহূর্তে আমার ভাল লাগছে, কিন্তু পরে তাতে আমার ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু এবার আমার সেটা করার অধিকার যদি খর্ব করা হয়, তাহলে তা আবার ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অধ্যাপক সেনের লেখায় নানা সময়ে উঠে এসেছে এই বিষয়গুলির তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে বহু মৌলিক চিন্তাভাবনা। পরের অংশে আবার এই বিষয়ে খানিকটা ফিরব, কিন্তু এখানে তাঁর কাজের যে ব্যবহারিক দিক, অর্থাৎ অসাম্যের যে সর্বাধিক সমস্যাজনক রূপ, অর্থাৎ, দারিদ্র, তা নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। আয়ের বিন্যাসে অসাম্য হল বিভিন্ন ব্যক্তির আয়ের মধ্যে যে ফারাক, তার একটা গড় হিসেব। আর, ন্যূনতম কোনও আয় (বা, জীবনধারণের খরচ)— যাকে দারিদ্ররেখা বলে— তার তলায় ক'জন আছেন এবং যাঁরা আছেন তাঁদের আয়ের বিন্যাস কী, এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক আলোচনায় দারিদ্রের ধারণাটা মাপা হয়।

প্রচলিত সূচকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল Headcount Ratio বা জনসংখ্যার অনুপাত আর Income Gap Ratio বা আয়-ব্যবধান অনুপাত। প্রথমটি খুব সোজা— দারিদ্ররেখার তলায় যতজন আছেন তাঁদের সংখ্যা গণনা করা। অন্য প্রচলিত সূচকটি, অর্থাৎ আয়-ব্যবধানের অনুপাত, প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তির আয় এবং দারিদ্রসীমার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ পরিমাপ করে তার একটা গড় সামগ্রিক 'ব্যবধান' হিসেব করে।[6]

---

[6]এই সূচকের সূত্র হল, দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত মানুষের সর্বমোট যে আয়-ব্যবধান, তাকে দারিদ্ররেখার তলায় থাকা মানুষেরা সবাই যদি ঠিক দারিদ্ররেখার আয় অর্জন করতেন সেই মোট আয়ের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা ।

দু'টি সূচকেরই সমস্যা আছে। প্রথম সূচকটি কতজন দরিদ্র তা বললেও, তারা কতটা দরিদ্র তা নিয়ে কিছু বলে না। দারিদ্রসীমার কাছাকাছি আয়ের অধিকারী একজন এবং যারা ভীষণ দরিদ্র তাদের মধ্যে কোনও তফাত করা হয় না। যদি দারিদ্ররেখার তলায় জনসংখ্যার অনুপাত কমানো সরকারের লক্ষ্য হয়, তাহলে যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে যাতে সবচেয়ে কম দরিদ্রদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে অর্থসাহায্য দেওয়া, যাতে তারা দারিদ্ররেখার ওপরে উঠে যেতে পারে, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে দেখলে তা আদর্শ নয়, কারণ দরিদ্রশ্রেণির মানুষের মধ্যে অর্থ হস্তান্তর প্রগতিশীল হতে গেলে, সর্বাধিক দরিদ্রদের অগ্রাহ্য করলে চলবে না।

দ্বিতীয় সূচকটির সমস্যা হল, একজন দরিদ্র ব্যক্তির থেকে টাকা নিয়ে দরিদ্রতর একজনকে দিলে তা প্রগতিশীল অর্থ হস্তান্তর বলেই পরিগণিত হবে, কিন্তু দুজনেই দারিদ্ররেখার নীচে থেকে গেলে আয়-ব্যবধানের অনুপাতের কোনও পরিবর্তন হবে না। তা ছাড়া, দরিদ্রশ্রেণির কিছু মানুষের আয় যদি দারিদ্ররেখার ওপরে উঠে যায় তাহলে জনসংখ্যার অনুপাত সূচকটি কমবে, কিন্তু আয়-ব্যবধানের অনুপাত একই থেকে যাবে, যদিও সাধারণ বুদ্ধিতে দারিদ্র কমেছে বলেই ধরা হবে।

অমর্ত্য সেনের অবদান হল এমন একটি সূচকের প্রস্তাব দেওয়া যাতে প্রচলিত এই সূচক দু'টির উল্লিখিত সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এটি এখন দারিদ্র মাপার অন্যতম জনপ্রিয় সূচকটি যাকে পরিভাষায় Sen index বলা হয়।[7] এই সূচকটিতে অধ্যাপক সেন দারিদ্ররেখার নীচে কতজন মানুষ আছেন এবং তাঁরা এই রেখা থেকে কতটা দূরে আছেন এই দুইটি দিক মিলিয়ে একটি সরল অথচ সুন্দর সূচকের প্রস্তাব দিয়েছেন যা কেবল দারিদ্ররেখার তলায় থাকা মানুষের সংখ্যাই বিবেচনা করে না, বরং দরিদ্রদের মধ্যে দারিদ্রের গভীরতা এবং বৈষম্যকেও বিবেচনা করে। আগের দুটো সূচক এবং দরিদ্রদের মধ্যে অসাম্যের সূচকটি জানা থাকলে, এই সূচকটি হিসেব করা সোজা। শুধু তাই নয়, সেটি এর আগে আলোচিত সূচক দু'টির যে দুর্বলতাগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলো এড়িয়ে যেতে সক্ষম।

দারিদ্র নিয়ে অধ্যাপক সেনের গবেষণার আলোচনায় দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর তাত্বিক ও পরিসংখ্যানমূলক কাজের উল্লেখ না করলে আলোচনা নেহাতই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর ১৯৮১ সালে প্রকাশিত *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press,1981) দারিদ্র নিয়ে আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনায় এবং গবেষণায় সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে। এই বইটির (এবং, সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির) তাৎপর্য এবং বক্তব্যের গভীরতা সংক্ষিপ্ত কোনও আলোচনায় ধরা মুশকিল। তবে যে মূল ধারণাটি এই বিষয় নিয়ে চর্চায় আমূল পরিবর্তন এনেছে তা একই সঙ্গে খুব সহজবোধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল, দুর্ভিক্ষ নানা কারণে হতে পারে, কিন্তু তার একটি কারণ হল দরিদ্রশ্রেণির মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া। তাই খাদ্যের জোগান সামগ্রিকভাবে অপ্রতুল না হলেও, একই সঙ্গে খাদ্যবস্তুর দাম যদি বাড়ে এবং মজুরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ যদি কমে, তা হলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

---

[7] এই বিষয়ে তাঁর 'Poverty: An Ordinal Approach to Measurement', *Econometrica*, Vol. 44, No. 2 (1976) দ্রষ্টব্য।

১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং তার ফলে অগণিত মানুষের মৃত্যুর পেছনে একাধিক কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে স্বাভাবিক পরিবহন এবং বন্টন ব্যবস্থায় নানা ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভের আশায় খাদ্যপণ্য মজুত করছিল, যার কারণে কৃত্রিম খাদ্যাভাব এবং মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু অধ্যাপক সেন দেখিয়েছেন এগুলো বাদ দিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াটিও কাজ করছিল। পরিসংখ্যান ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলায় মোট খাদ্য সরবরাহ নাটকীয়ভাবে কমেনি, এবং কিছু ক্ষেত্রে, দুর্ভিক্ষের আগের বছরের তুলনায় আরও ভাল ছিল। তাঁর মতে যা পাল্টেছিল তা হল কিছু গোষ্ঠী, বিশেষ করে কৃষিশ্রমিকরা, তাদের মজুরির হারের তুলনায় অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মুখোমুখি হয়েছিল, যা তাদের খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। অনাহার এবং মৃত্যুর খবর যখন আস্তে আস্তে ছড়াতে শুরু করে, তখন ঔপনিবেশিক সরকার যেভাবে সমস্যাটার মোকাবিলা করে, তা ব্রিটিশ শাসনের একটি কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল ধীর, অপর্যাপ্ত এবং খাদ্যবন্টন ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায় কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে ত্রাণ প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি অভাবী এবং নিরাপত্তাহীন মানুষদের কাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বিভিন্ন দুর্ভিক্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে দুর্ভিক্ষ বা অনাহারের সম্ভাবনা দেখা দিলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ভূমিকা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।[৪] ঔপনিবেশিক ভারতে, সোভিয়েট আমলে ১৯৩২-৩৩ সালে ইউক্রেনে, বা গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড নীতির ফলে চিনে ১৯৫৯-৬১ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথা গণমাধ্যমে প্রচারিত হত এবং তার চাপে সরকারি খাদ্যবন্টনব্যবস্থা যদি সমস্যার মোকাবিলায় সক্রিয় হত, তাহলে এত বেশি মানুষের মৃত্যু হত না।

দুর্ভিক্ষর মতো চরম সংকট যদি বাদও দেওয়া হয়, বাজার অর্থনীতিতে অতিদরিদ্রশ্রেণির মধ্যে অনাহার বা স্বল্পাহার এবং অপুষ্টির যে সমস্যা, তার মোকাবিলা করতে খাদ্যবন্টন ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের গুরুত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি কিন্তু অমর্ত্য সেনের এই বিষয়ে গবেষণার থেকেই উৎসারিত। দরিদ্রশ্রেণির মানুষের বাজেটে খাদ্যের গুরুত্ব এবং বেঁচে থাকার জন্যে এবং কর্মসক্ষম হবার জন্যে খাদ্যের যে বিশেষ ভূমিকা, এই কথাগুলো মনে রাখলে শুধু চাহিদা আর জোগানের ওপর খাদ্যদ্রব্য বন্টন ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া যায় না, এই শিক্ষা অধ্যাপক সেনের দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণার বৃহত্তর ও সময়োত্তীর্ণ তাৎপর্য।

৪

অসাম্য ও দারিদ্রের পরে এবার আসি মূলধারার অর্থনীতিতে আয় বা তার বৃদ্ধির হারের মতো প্রচলিত মাপকাঠিগুলোর সংকীর্ণ পরিধি থেকে উন্নয়নের ধারণাটিকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সেনের মৌলিক অবদানে। মাপকাঠি হিসেবে আয় বা তার বৃদ্ধির হারের সীমাবদ্ধতা সর্বজনবিদিত, কিন্তু ‘জীবনযাত্রার মান’-এর মতো আপাতদৃষ্টিতে আত্মগত এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিনির্ভর ধোঁয়াটে ধারণাটিকে কী করে বাস্তবসম্মত কোনও সূচকে ধরা যায়, তার উত্তর সোজা নয়। উন্নয়ন

[৪] এই বিষয়ে তাঁর জঁ দ্রেজ-এর সঙ্গে লেখা ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বই *Hunger and Public Action* বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

অর্থনীতির বাইরে অধ্যাপক সেনের গবেষণার যে মূল বিষয়, অর্থাৎ কল্যাণমূলক অর্থনীতি, তাতে তাঁর বিস্তারিত এবং মূল্যবান গবেষণার আলোচনায় না ঢুকে এখানে বর্তমানে বহুলব্যবহৃত কিছু উন্নয়নের সূচকের উৎস কীভাবে তাঁর চিন্তাভাবনার ওপরে ভিত্তি করে হয়েছে, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

২০১২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বিশ্ব সুখ রিপোর্ট (World Happiness Report) বেরোচ্ছে। এর ভিত্তি হল 'গ্যালপ' বিশ্বসমীক্ষায় একটি প্রশ্নের উত্তর, যাকে ক্যান্ট্রিল ল্যাডার বলা হয়। সেটি হল, "এমন একটি সিঁড়ি কল্পনা করুন, যার সবচেয়ে নীচের ধাপের নম্বর হল শূন্য, আর সর্বোচ্চ ধাপের নম্বর হল দশ। সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপটি আপনার জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম জীবন এবং সিঁড়ির নিম্নতম ধাপটি আপনার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি এই সময়ে কত নম্বর ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন?" রিচার্ড লেয়ার্ডের মতো অর্থনীতিবিদের মতে, এটাই হল জীবনযাত্রার মানের আসল সূচক কারণ আর বাকি সবগুলি তার উপাদান মাত্র। তবে এই সূচকটির কোনও নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠি নেই, তা ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সামাজিক-প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। তাই দুই দেশ বা দুই সময়ের তুলনামূলক বিচারে ব্যক্তিগত অনুভূতি-নির্ভর এই সূচকগুলি খুব একটা কাজে আসে না।

আয় যদি উন্নয়নের সূচক হিসেবে বেশি সঙ্কীর্ণ মনে হয়, আর সুখ বা জীবন নিয়ে তৃপ্তি ব্যাপারটা খানিকটা ধোঁয়াটে হয়, তার মাঝামাঝি রফা হল মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)।

এই সূচক যে ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তা হল অমর্ত্য সেনের সক্ষমতার তত্ত্ব (capability theory)। অমর্ত্য সেনের মূল বক্তব্য: উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল 'সক্ষমতা'-র (capability) ক্রমবিকাশ। মূলধারার অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে আয় দিয়ে জীবনযাত্রার বস্তুগত দিকটা ধরা পড়ে, অথচ সবাই জানে বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের মধ্যে সম্পর্কটা সরল নয়। তাই আয়-কে উন্নয়নের একটা উপকরণ ভাবা যেতে পারে মাত্র। আবার কল্যাণমূলক অর্থনীতি তৃপ্তিযোগ (Utility) বা সুখের ওপর ঝোঁক দেয়, যেটাকে উন্নয়নের প্রভাব বা ফলাফল ভাবা যেতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি বা বিচার-নির্ভর হওয়ায় তা মাপা মুশকিল, আর মানুষে মানুষে (বা, দেশে দেশে) তার ফারাকের অর্থ ব্যাখ্যা করা মুশকিল। সক্ষমতা তত্ত্বের মূল আকর্ষণ হল, একদিকে উন্নয়নের উপকরণ আর অন্যদিকে তা নিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির তুলনায় তা একটি বিকল্প ধারণার প্রস্তাব দেয় যা একই সঙ্গে তত্ত্বগতভাবে সন্তোষজনক আবার যাকে ব্যবহারিকভাবে বা বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। প্রথমটির কারণ হল, অর্থ যেমন মানুষকে অনেক বিকল্প দেয় কিন্তু তারপর সে কীভাবে তা ব্যবহার করবে সেটা তার নিজস্ব রুচি এবং বিচারের ওপর নির্ভর করবে, সক্ষমতাও তা-ই, কিন্তু সক্ষমতা এই ধারণটাকে আরও প্রসারিতভাবে দেখে। শুধু অর্থ নয়, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য এবং নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের ওপর সক্ষমতা নির্ভরশীল। মানুষ কী করতে এবং কী হতে সমর্থ, সক্ষমতা সেটাকে ধরার চেষ্টা করে, তারপর সে কী করবে সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং তাতে সে কতটা সুখী হবে সেটা তার অনুভূতি বা জীবনদর্শনের ওপর নির্ভর করবে। একই সামর্থ্যের দুজন মানুষ খুব আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কেউ হয়তো স্বল্পাহারী কারণ সে স্বাস্থ্যসচেতন আর কেউ স্বল্পাহারী কারণ সে অভাবী— সক্ষমতার নিরিখে তারা আলাদা। আবার শুধু অর্থ নয়,

এখানে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নানা অধিকারের ভূমিকা আছে, যা আয়ভিত্তিক সূচকগুলি থেকে তাকে আলাদা করে— একই আয় বা বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও যে সমাজে নারীদের অধিকার অপেক্ষাকৃতভাবে কম, তাদের সক্ষমতা কম ধরা হবে। উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে তাই অধ্যাপক সেন সক্ষমতা এবং স্ব-ক্ষমতা (freedom)-এর বিকাশের সঙ্গে চিহ্নিত করছেন, যা উন্নয়ন নিয়ে আমাদের প্রথাগত ধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে।

শুধু তত্ত্বের দিকে থেকে নয়, সক্ষমতাভিত্তিক উন্নয়নের একটি ব্যবহারিক পরিসংখ্যানভিত্তিক সূচকের প্রস্তাবেও অধ্যাপক সেনের প্রত্যক্ষ অবদান আছে। মাহবুব উল হকের নেতৃত্বে ১৯৯০ সাল থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে 'মানব-উন্নয়ন সূচক'-এর সূত্রটি, এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক অবস্থান, পেশ করা হয়, তারপর থেকে তা প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে আসছে। উন্নয়নের আলোচনায় আয়, আয়বৃদ্ধির হার, দারিদ্র ও অসাম্যের সূচকের সঙ্গে এটিও এখন সর্বদা উল্লিখিত হয়। এই সূচকটির প্রবর্তক অমর্ত্য সেন ও তাঁর সহযোগী কিছু অর্থনীতিবিদ, যার মধ্যে মেঘনাদ দেশাই এবং সুধীর আনন্দ আছেন। এই সূচকটি মূলত তিনটি সূচকের গড়, তার একটি হল গড় জাতীয় আয়, একটি হল গড় আয়ু (যা হল স্বাস্থ্যের মানের সূচক) এবং তৃতীয়টি হল শিক্ষার মানের একটি সূচক। আগে এটার ভিত্তি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষরতার হার, এবং স্কুলে ভর্তি থাকার হার (enrolment rate), ২০১০ সাল থেকে এটার ভিত্তি হল গড় স্কুলশিক্ষার মেয়াদ (mean years of schooling)। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা শুধু জাতীয় আয় বাড়ানোর সহায়ক উপাদানমাত্র নয়, জীবনযাত্রার মানেরও এক আবশ্যক মাত্রা এবং সেই কারণে মানব-উন্নয়ন সূচকে তাদের ব্যবহার সক্ষমতা তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ।[9]

উন্নয়নের এত সূচক ও তাদের ভাল-মন্দ বিচারের আলোচনায় পাঠকের ধন্দ লেগে যেতে পারে, কিন্তু এদের পেছনে যে মূল ভাবনাচিন্তাগুলো আছে, সেগুলো বোঝা খুব শক্ত নয়। মানুষের স্বাস্থ্যের যেমন অনেক দিক আছে, এবং সেগুলো নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করা যেতে পারে, এবং তাদের ফলাফল দেখে বিভিন্ন রোগের আন্দাজ করা যেতে পারে, উন্নয়ন ও তার বিভিন্ন সূচকের ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। যদি কোনও দেশে বা রাজ্যে সবাই সমান হত, তাহলে সবার আয় বা প্রত্যাশিত আয়ু ইত্যাদিও সব সমান হত, তাই এসবের গড় মান দেখাটাই যথেষ্ট হত, বৈষম্যের কথা ভাবতে হত না। কিন্তু, তাহলেও আয় না আয়ু না শিক্ষা না স্বাস্থ্য না জীবন নিয়ে তৃপ্তি কোনটা জীবনযাত্রার মানের সঠিক মাপকাঠি তা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। আবার এই মাপকাঠির যে কোনও একটি (বা তাদের কোনও সমষ্টি) নিয়ে যদি আমরা একমত হতেও পারি, যেহেতু মানুষে মানুষে অনেক তফাত, সেই বৈষম্য কী করে মাপা হবে তা নিয়েও বহুমত থাকতে পারে।

---

[9]আরও কিছু সূচক ব্যবহার হয় উন্নয়নের আলোচনায়, তার অধিকাংশই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে মানব উন্নয়ন সূচকে ব্যবহৃত মাপকাঠিগুলির বিকল্প, যেমন শিশুমৃত্যুর হার, শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার, স্কুলের বিভিন্ন স্তরে ভর্তির এবং পাশের হার ইত্যাদি। অমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রেজ-এর ২০১৩ সালে প্রকাশিত বই *An Uncertain Glory* (Penguin) (বাংলা তর্জমায় *ভারত: উন্নয়ন ও বঞ্চনা*, আনন্দ ২০১৫)-তে এগুলির উদাহরণ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ২০১০ সাল থেকে যে বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক প্রকাশিত হচ্ছে, তার তাত্ত্বিক কাঠামোও অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা-তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে।

উন্নয়নের অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেনের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব হল, তিনি উন্নয়ন কী এবং তাকে কীভাবে মাপা হবে এই নিয়ে চিন্তাকে মূলধারার অর্থনীতির সংকীর্ণ পরিসর থেকে মুক্ত করেছেন, আবার তাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে কীভাবে পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা যাবে, তা নিয়েও একই সঙ্গে যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন তা এখন আমরা সর্বদা ব্যবহার করি এবং সবসময়ে সচেতনও থাকি না। হয়তো তাঁর অবদানের সবচেয়ে বড় সাফল্য সেখানেই।[10]

[এই বিষয়টি নিয়ে দেবরাজ রায়, টিমোথি বেসলি, অচিন চক্রবর্তী, পুষ্কর মৈত্র, অর্জুন জয়দেব, রীতিকা খেড়া, তনিকা চক্রবর্তী এবং অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। আর মনীষিতা দাশ, তনিকা চক্রবর্তী, এবং অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় লেখাটির প্রাথমিক খসড়া পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।]

---

[10]আগেই বলেছি, উন্নয়নের অর্থনীতিতেই তাঁর আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে, যা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হল না।